ইসলাম : শোষক শ্রেনীসমূহের মতাদর্শ ও হাতিয়ার

নাসরীন জাযায়েরি

পূর্ববর্তী পর্বের পর .....

২. ইসলামি শক্তিসমূহের উত্থানের কারন

তিন দশক আগে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে শাসকশ্রেণী ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী পৃষ্ঠপোষক বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল ইহজাগতিক-সাচ্চা কমিউনিস্ট শক্তি, সোভিয়েত পন্থী ভূয়া কমিউনিস্ট শক্তি এবং ইহজাগতিক জাতীয়তাবাদী শক্তি। ইরান, মিশর ও ফিলিস্তিনের দিকে লক্ষ্য করুন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে শাহের শাসন ও তার সাম্রাজ্যবাদী প্রভু বিরোধী ইরানের প্রধান দুটি রাজনৈতিক শক্তি ছিল সোভিয়েত পন্থী তুদেহ পার্টি এবং মোসাদ্দেকের নেতৃত্বাধীন জাতীয় ফ্রন্ট, যা ১৯৫৩ সালে মোল্লাদের মদতপ্রাপ্ত সি আই এ পরিচালিত কু-দেতার মাধ্যমে উৎখাত হয়েছিল। আরব দেশগুলোতে এরা ছিল প্রধানত ইহজাগতিক জাতীয়তাবাদী শক্তি। মিশরে এই শক্তিসমূহের নেতৃত্বে ছিল জামাল আবদুল নাসের, যে কিনা সাচ্চা বিপ্লবী শক্তিগুলোকে দমন করার পাশাপাশি বিদেশী আধিপত্য বিরোধী পতাকাকে তুলে নিয়েছিল। ফিলিস্তিনে ইসরাইল বিরোধী সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয় ইহজাগতিক জাতীয়তাবাদী শক্তি ও বামঝোঁকা ফিলিস্তিনি শক্তিসমূহ ; প্রধানভাবে ১৯৮০-র দশকে ইসলামি শক্তিগুলো তাদের প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই প্রশ্ন ওঠে কী কী কারণ ইসালামি আন্দোলনের ইন্ধন যোগাচ্ছে। নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলো অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে : ১. কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী সুচিন্তিত কর্মনীতির মাধ্যমে ইসলামি রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে রাজনৈতিক মঞ্চে নিয়ে আসা হলো ; ২. সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের ফলে কীভাবে এসব শক্তির বিকাশের কাঠামো সৃষ্টি হয় ; ৩. কীভাবে বিপ্লবী কমিউনিস্টদের রক্তাক্ত দমন পীড়ন ও ব্যর্থতা শূন্যতা সৃষ্টি করে যা এদের দ্বারা পূরণ হলো।

ইসলামি শক্তিগুলোর ক্রমবর্ধমান প্রভাবের সুস্পষ্ট কারণগুলোর একটি হলো ইসলামি শক্তিগুলোকে উস্কিয়ে দিয়ে বিপ্লবী জনসাধারণকে বশে রাখা ও সেই সাথে সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীদের অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখা সংক্রান্ত পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও মধ্যপ্রাচ্যের তাদের তাবেদার রাষ্ট্রগুলোর সুচিন্তিত কর্মনীতি। ১৯৭০-র দশকে সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে স্ব স্ব শাসক গোষ্ঠীর সম্মতি ও উৎসাহে মসজিদের এক জাল গড়ে তোলা হয়। ১৯৭৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মদতপুষ্ট এক কু-দেতার মাধ্যমে পাকিস্তানে জেলারেল জিয়াউর হক ভুট্টোকে উৎখাত করে এবং পাকিস্থানি সংবিধানে শরিয়া আইন অন্তর্ভুক্ত করে। ইরানে পশ্চিমা শিক্ষাপ্রাপ্ত ইসলামি পন্ডিতবর্গের নেতৃত্বাধীনে প্রতিষ্ঠিত রাজকীয় দর্শন সমিতি এই থিসিস সামনে নিয়ে আসে যে, ইরানি সমাজের প্রয়োজন ইসলামের আদর্শে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ এক নতুন ভাবাদর্শগত পরিচয়। বিপ্লবী কমিউনিস্ট শক্তিকে খুঁজে বের করা, হত্যা করা, বন্দি করা বা দেশন্তরী করার দিকে ঠেলে দেওয়ার পাশাপাশি বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে ইসলামি চিন্তার প্রসার ঘটানোর জন্য সকল প্রকার ইসলামি আলোচনা ফোরামকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়। ব্যবসায়ী ও সুদ কারবারীদের সাথে মোল্লাদের মৈত্রীকে মসজিদের নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং বাড়ি বাড়ি ইসলামি প্রচারের সুযোগ দেওয়া হয়। এমন কি শাহকে সমালোচনা করার বেশ কিছুটা পরিমাণে স্বাধীনতাও তাদেরকে দেওয়া হয়। কেবলমাত্র ইরানের গণমুজাহিহীন নামে একটি ছোট গোপন ইসলামি বাম গেরিলা সংগঠন এই স্বাধীনতা

পায়নি। ১৯৮০ সালে তুরস্কে আতাতুর্কপন্থী ধর্মান্ধ সামরিক কু-দেতার পর ইহজাগতিক ধারণা সম্পন্ন জেনারেলগণ ইসলামি নেতা আরবাকানকে ইতিপূর্বে তাদেরই দেওয়া নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য সুইজারল্যান্ডে যায়। সে ফিরে এসে ইসলামি রেফাহ পার্টি গঠন করে। মূল জনসাধারণের ওপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামি স্কুলগুলোকে দেওয়া হয় কোটি কোটি ডলারের অনুদান। কুর্দী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে পাল্টা সামরিক অভিজান চালানোর সময় তুর্কি সৈন্যবাহিনী হেজবুল্লাহ শক্তিগুলোকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে।

এ কথা সত্য যে, মধ্যপ্রাচ্যের নিপীড়ক সমাজ পরিচালনাকারীরা রাজনীতির মঞ্চে ইসলামি শক্তিগুলোকে আসীন করাবার সুচিন্তিত নীতি নিয়েছিল। কিনুত প্রশ্ন হলো এদের গড়ে ওঠা ও শক্তি বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত কারণগুলো কী? একথা বলতেই হবে, এই সকল শক্তি নিজেদের সমাজগুলোকে পেছন দিকে ঠেলে নেবার প্রতিজ্ঞার ঘোষনা দিলেও, তাদেরকে স্রেফ 'অতীতের প্রতিধ্বনি' বলা চলে না। তারা মধ্যপ্রাচ্যের সমাজগুলোর আধুনিক কাঠামোরই সৃষ্টি যেগুলো নিজেরা আবার এই সকল সমাজের গভীরে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের ফসল, যা এসব সমাজকে পুনর্গঠিত করেছে ও সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিশ্বজোড়া ছড়ানো জালের সাথে জড়িয়ে নিয়েছে। মানবিক দুর্ভোগের বিবেচনায় এ হচ্ছে ইতিহাসের জঘন্যতম এবং অত্যন্ত কুটিল এক প্রকৃয়া। এ হচ্ছে এক চলমান প্রক্রিয়া যা জন্মে দেয় সংকট এবং বিশ্বের জনগণের জন্য বয়ে আনে বিশাল আকারে দুর্ভোগ - 'বিশ্বায়ন' হচ্ছে যার সর্বশেষ অধ্যায়।

ইসলামি মৌলবাদের উত্থান এ অঞ্চলের নয়া উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর অমোচনীয় সংকটকে ও এর স্থায়ী ব্যাপকতর দারিদ্রকে প্রতিফলিত করে, অন্যদিকে এই অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ পশ্চিমা দেশগুলোতে চালান হয়ে যায়। এটা প্রতিফলিত করে মধ্য শ্রেণীর আকস্মিক উত্থান ও পতনকে, দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তয়ে জনসাধারণের স্থানান্তর ও দেশান্তর গমনকে আর প্রতিফলিত করে বিশ্ব পুঁজিবাদের ঘূর্ণাবর্তে আকর্ষিত হবার সাথে প্রাকপুঁজিবাদী যুগে পড়ে থাকা অবস্থার মধ্যেকার বিরামহীন সংঘাতকে। এই দেশগুলো রয়েছে এক লাগাতার উথাল-পাতাল অবস্থায়। এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলোও জড়িয়ে আছে তিক্ত ভা-ন ও বেপরোয়া প্রতিযোগিতায়।

মধ্যপ্রাচ্যের সমাজগুলোতে দীর্ঘকাল ধরে ইসলাম শাসক মতাদর্শ হিসেবে বিরাজমান। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও উপনিবেশবাদীদের দ্বারা মধ্যপ্রাচ্যের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আগে বা পরে উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ শাসন কাঠামোর অংশ হিসেবে বিরাজ করেছে। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে শাসন কাঠামোর মধ্যে এর অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তন ঘটছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশরা তাদের আধিপত্যহীন দেশসমূহে বড় ধরনের রূপান্তর ঘটায়। সাম্রাজ্যবাদী পরিভাষায় আজা যাকে 'জাতিগঠন' বলা হচ্ছে তারা তাই করছে : প্রতিষ্ঠা করছে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র যার আধুনিক সেনাবাহিনী ও পুলিশ, সড়ক ও রেলপথ ইত্যাদি, এর সবই ছিল সদ্যোজাত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দুর্গ গঠনের অংশ, আর এর ফলে জন্ম নেয় ইরানের রেজাশাহ্ ও তুরস্কের আতাতুর্কের মতো চরিত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আরেকটি সন্ধিক্ষন উপস্থিত হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্থান দখল করার পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের আধিপত্যাধীন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশে বড় ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠন চালায়। ফলশ্রুতিতে এক নতুন শ্রেণীবিন্যাসের সৃষ্টি হয় : শ্রমজীবী শ্রেণীর বিকাশ ঘটে আর আধুনিক স্কুল ব্যবস্থা সৃষ্টি করে আধুনিক বুদ্ধিজীবীদেরকে, যাদের কেউ কেউ হয়ে উঠে রাষ্ট্রীয় কর্ণধার এবং টেকনোক্রাট, অন্যরা যোগ দেয় প্রগতিশীল ও বিপ্লবীদের কাতারে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের একটা বড় অংশই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বেশির ভাগ দেশেই আইন কানুনের উপর তাদের ভেটো ক্ষমতা উল্টে ফেলা হয়।

১৯৭৯ সালে ইরানে যে ইসলামি শক্তি ক্ষমতা দখল করেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাদেরকে ক্ষমতা কাঠামো থেকে ছেটে ফেলা হয়েছিল। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সামন্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং সংশ্লিষ্ট উপরিকাঠামো সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের পৃথক পৃথক তরঙ্গে জোরালো আঘাতপ্রাপ্ত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন বৃটিশরা আধা-উপনিবেশিক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকাঠামো প্রবর্তন করে তখন প্রথমবারের মতো এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আবারো কয়েকটি ধাক্কায় এককালে যে মোল্লাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ছিল রাষ্ট্রক্ষমতার শক্তিশালী খুঁটি তাকে একপাশে সরিয়ে দেয়া হয়। ১৯৬০ এর দশকে 'শ্বেত বিপ্লব' এর নামে ইরানের শাহ্ মার্কিনি মদদপুষ্ট ভূমি ও অন্যান্য সংস্কার পরিচালনা করে। এগুলো মোল্লাতন্ত্রকে বেশ পরিমাণে দুর্বল করে। তবে শ্বেত বিপ্লব সামন্তবাদকে নির্মুল করেনি ; এটা আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীকে স্রেফ পুনর্গঠিত করে এবং তাকে বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্কের সাথে সংযুক্ত করে। তাছাড়া, যেহেতু 'আধুনিক' সম্পর্কের অধিকতর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল পুঁজিবাদের ভিত্তিতে এবং তা ছিল বিরাজমান রাষ্ট্রকাঠামোকে রক্ষা করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত, এটা সামন্ততান্ত্রিক প্রতিনিধি, ধ্যান-ধারণা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে চূড়ান্ত ফয়সালায় যেতে চায়নি বরং বিপরীতে নয়া উপনিবেশিক ব্যবস্থার মধ্যে এদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আপোস করেছে। আয়াতুল্লাহ খোমেনি শাহ্-এর শ্বেত বিপ্লবের দুটি বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে : অত্যন্ত সীমিত পরিমাণে হলেও কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টন এবং নারীদের ভোটাধিকার প্রদান । 'আধুনিকীকরণ' উদ্যোগ পাথরে ঠোক্কর খাওয়ার পর ইতিপূর্বে ক্ষমতার কাঠামো থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলা ইসলামি শক্তিগুলোকে শাহ্ এবং তার মার্কিনি প্রভুদের মুন্ডুপাত করতে ফিরে আসে। সাম্রাজ্যবাদী আধুনিকায়ন ভারসাম্যহীন ও বিযুক্ত অর্থনীতি এমন মাত্রায় গড়ে তুলেছিল যে তা কেবল কোটি কোটি জনগণের জীবনে দুর্ভোগ নিয়ে আসেনি, তা এমনকি হয়ে ওঠে অকার্যকর।

অন্যান্য দেশে যেমন মিশরেও একই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে। ১৯৬০-এর দশকের যে আধুনিকায়নের সূচনা তা কৃষক সাধারণকে ব্যাপক সংখ্যায় উৎখাত করেছে। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এদেরকে নাম সর্বস্ব আধুনিক কারখানা, কৃষি-বাণিজ্য এবং অধিকাঠামো নির্মাণের কর্মতৎপরতায় আত্মস্থ করে নিতে পারেনি।

পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়েই এটা ছিল বড় ধরনের এক সাধারণ ব্যাপার গ্রামাঞ্চল থেকে উচ্ছেদকৃত জনসংখ্যায় শহরগুলো উপচে পড়ে। ১৯৬০-এর দশকে গড়ে ওঠা শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী-যার একটি বহিঃপ্রকাশ হলো সেকুলার বা ইহজাগতিক স্কুল ব্যবস্থার বৃদ্ধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি-সংকুচিত হয়ে আসতে শুরু করে। মোল্লাতন্ত্রের কেন্দ্র থেকে উৎসারিত ইসলামি আন্দোলনগুলো শহরে ফুলে ফেপে ওঠা গরীব জনসাধারণের ক্রোধের সাথে এবং শহুরে বুদ্ধিজীবিদের একাংশের সাথে সংযুক্ত হতে তাদের সমস্ত মেধা ব্যবহার করে।

ইরানের শাহ্ ও তার মার্কিনি প্রভুদের বিরুদ্ধে একটি স্বল্প কিন্তু তীব্র ও উত্তাল সময়কালের জন্য বিপ্লবী কমিউনিস্টগণ, পশ্চাদপন্থী ধর্মীয় শক্তি এবং জাতীয়তাবাদীরা নিজেদেরকের এক পক্ষে সামিল দেখতে পায়। শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একাংশ, প্রধানভাবে উৎখাত হয়ে আসা ব্যাপক কৃষক সাধারণ আয়াতুল্লাহ খোমেনিকে অনুসরণ করে। এ কথা সত্য নয় যে, উচ্ছেদ হওয়া এই দরিদ্র জনসাধারণ অন্তর্গতভাবেই ইসলামপন্থী। বাস্তবতা এই যে, সমাজের আধা-সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ইসলামি মতাদর্শ বেরিয়ে আসে, আর নিপীড়িত জনসাধারণ তার শরণাপন্ন হয়। ১৯৭৯ সালে ইরানের রাজধানী তেহরানে খোমেনিকে যারা স্বাগত জানিয়েছিল সেই গরীব শহুরে জনসাধারণই একদশক আগে মাহভাস নামের জনপ্রিয় গায়িকা-নর্তকীর মৃত্যুতে শোকমিছিল করেছে।

তৃতীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হেতু হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভেতরকার সংকট। এই সংকটের প্রথম উৎস হলো ১৯৫০-এর দশকের মধ্যভেগে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। স্থিতাবস্থা বিরোধী জনসাধারণের মাঝে ইসলাম যে এমন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছে তা কোনো রাজনৈতিক প্রাণশক্তি, তত্ত্বগত স্বচ্ছতা বা ব্যবহারিক র‍্যাডিক্যালপন্থার কারণে নয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যকার সংকট জনসাধারণের মধ্যে নেতৃত্বের ব্যাপক শূন্যতার সৃষ্টি করে। ইসলামি শক্তিসমূহ এটাকে পূরণ করে, যাদেরকে আবার পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো মদত যোগায়। মধ্যপ্রাচ্যসহ সমগ্র বিশ্বের কমিউনিস্ট এবং বিপ্লবী সেকুলার বা ইহজাগতিক আন্দোলনের বৃদ্ধিতে যেমনভাবে রাশিয়ার (১৯১৭) এবং চীনের (১৯৪৯) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আর মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব (১৯৬৬) উৎসাহ যুগিয়েছে, তেমনভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি এর ও সোভিয়েতপন্থী পার্টিগুলো প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতা করতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা ইরানের শাহ্ এবং আরব দেশগুলোতে আরব সমাজতন্ত্র ও ইসলামি সমাজতন্ত্রের মাঝে প্রগতিশীল উপাদান "আবিস্কার" করে। চীনের সংশোধনবাদী ক্যু-দেতা (১৯৭৬) হচ্ছে দ্বিতীয় বড় ধরনের আঘাত, যা কিনা ১৯৮০-র দশকে এ সকল দেশে এমনকি বিশ্ব পরিসরের কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভয়ংকর সংকট সৃষ্টি করে। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সত্যিকার বিপ্লবী কমিউনিস্ট শক্তিগুলোর রক্তাক্ত দমনের পাশাপাশি এসব পরাজয় ইসলামের পতাকা তলে বিরোধী শক্তির বিকাশের সুযোগ করে দেয়। যখন ভাববাদ, অজ্ঞানতা ও সাম্রাজ্যবাদের কোনো শক্তিশালী বিকল্প থাকে না তখন পাঁচ মিশালি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো সুযোগের সদ্ব্যবহার করে।

চীন যখন লাল ক্ষমতার ঘাঁটি ছিল, তখন তা বিপ্লবের পক্ষে এবং সমাজের বিপ্লবী দিশার জন্য জোরালো যুক্তি যুগিয়েছে। সবখানেই নিপীড়িত জনসাধারণের জন্য চীন ছিল এক শক্তিশালী চুম্বকবিশেষ। যে জনগণ নিজেরাই দুনিয়াকে বদলাতে সাহসী হয়েছে এবং কোনো ঈশ্বর এসে তাদের ভাগ্য বদলে দিক তার অপেক্ষয়ায় কখনো বসে থাকেনি তাদের জন্য চীন ছিল এক পতাকা। এ দেশ ছিল আন্তর্জাতিকভাবে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা সারা দুনিয়ার জনগণের সংগ্রামে সহযোগিতা দিয়েছে। তা বিশ্বের নিপীড়িতদের যুগিয়েছে আশা ভরসা।

সাম্রাজ্যবাদী উন্মত্ততা ইসলামি মৌলবাদের চেয়ে ভালো কিছু নয়

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইসলামি মৌলবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যা ঘোষণা করে যে, এই সকল দেশের সমস্যাগুলোর সর্বাগ্রে ও প্রথম সমস্যাটি এসেছে 'ভেতর' থেকে, "এর সকল দায় আমারা বিদেশীদের ঘাড়ে চাপাতে পারি না", অন্যকথায় উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ এজন্য দায়ী নয়। এ যুক্তির মাঝে কিছুটা মাত্রায় সত্য রয়েছে, আর তা হলো মধ্যপ্রাচ্য এবং আরো অনেক দেশ বহু বছরের পুরনো যে সমস্যায় খাবি খাচ্ছে অর্থাৎ সেই ব্যাপক সামন্ত অবশেষের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিন্তু আরো বেশি সত্য হলো এই যে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় এসব দেশ সংযুক্ত হওয়ার পর থেকে, এসব 'আভ্যন্তরীণ' ও 'বাহ্যিক' সমস্যা পরস্পর জড়িয়ে গেছে-সমস্যাটা এসেছে নির্দিষ্ট কতগুলো শ্রেণীর শাসন ও তাদের শাসক মতাদর্শ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়া থেকে। এই শ্রেণীগুলোর শিকড় রয়েছে শ্রমিক ও কৃষকদের পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মাঝে, আর একই সাথে তারা বিশ্ব ব্যবস্থার

সাথেও সংযুক্ত। এই সকল দেশের চলমান সমস্যাগুলো সুদূর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, সমসাময়িক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদী যুগের ফসল। এসকল সমাজের অগ্রগতির বাধাগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত না করে কেউ সমাধানের পথ খুঁজে পাবে না। ইসলামি শক্তিগুলো এবং যারা সাম্রাজ্যবাদকে আড়াল করে, সমস্যার একেবারে গোড়ার কারণ সম্পর্কিত ধারণার প্রশ্নে তারা উভয়েই ভ্রান্ত। কাজেই, তাদের সমাধানও ভ্রান্ত। প্রথম পক্ষ প্রতিক্রিয়াশীল কর্মসূচি নিয়ে পেছনে ফিরে যাবার প্রস্তাব করে। দ্বিতীয় পক্ষ সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার দিকে চোখ বুজে থাকে, কারণ তাদের কাছে সাম্রাজ্যবাদী বোমাগুলো হলো এসব দেশে ছড়িয়ে দেওয়া আধুনিকতা আর শিক্ষা সংস্কৃতির বীজ। মধ্যপ্রাচ্যের বুদ্ধিজীবীদের উপরের সারির মাঝে সাম্রাজ্যবাদপন্থী লাইন সবসময় বিরাজ করেছে। তাদের নিজেদের ইচ্ছা ছাড়াও প্রায়শও এটা তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদের টেকনোক্রাট হিসেবে তৈরি করেছে।

বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তথা সাম্রাজ্যবাদ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলোকে রক্ষা করেছে, বিশ্বের অজস্র জনগণকে টেনে নিচ্ছে দুঃসহ যন্ত্রণা ও অনাহারে আর সারা দুনিয়াকে বঞ্চিত করছে জনসাধারণের সৃজনশীলতা, সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক ক্ষমতার সর্বব্যাপী বিকাশের ব্যাপক সম্ভাবনার শক্তি থেকে। এই বিশ্বব্যবস্থার কাঠামোগত রূপই দেওয়া হয়েছে এমনভাবে যাতে তৃতীর বিশ্বের জনসাধারণ নিজেদের ক্ষমতায়ন ঘটাতে না পারে। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ নিপীড়িত দেশগুলোকে পশ্চাদপদ অবস্থায় আটকে ফেলেছে। এই সাধারণ তথ্যের দিকে লক্ষ্য করুন : পৃথিবীর এই অংশে মার্কিনি সাম্রাজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক অবকাঠামো গড়ার খাতিরে গোত্রের নেতাদের রাজনৈতিক ও সামরিক বশ্যতা কিনে নিতে মার্কিন সেনাবাহিনী আফগানিস্তানে বস্তা বস্তা ডলার নিয়ে অবতরণ করেছে। ডলার হচ্ছে একটি সামাজিক সম্পর্ক। এটা বিশ্বের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকে রূপদান করে। সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও নিপীড়িত জাতিসমূহের মধ্যকার সম্পর্কের কাঠামো বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্রেফ অংশ মাত্র নয়, বরং নির্ধারক অংশ। নিপীড়িত জাতিগুলোর অভ্যন্তরীণ শ্রেণী ও সামাজিক সম্পর্কসমূহ গড়ে তোলার ক্ষত্রে সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে প্রধান শক্তি। এসকল নিপীড়িত জাতির ভেতরকার প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীসমুহ অর্থাৎ বড় ভূস্বামী, শিল্পপতি, বণিক ও ব্যাংক মালিকরা হলো বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার শ্রেণীগত মিত্র। এসব জাতির ভেতর এরা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী "কর্মীবাহিনী"। কখনও কখনও প্রভু সাম্রাজ্যবাদীদের ও স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলোর মধ্যকার সম্পর্কে টানাপোড়েন ঘটে। তথাপি, চুড়ান্ত বিশ্লেষণে সমস্ত মুৎসুদ্দি শ্রেণী হিসেবে নির্ভর করে সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে তাদের নানাবিধ সম্পর্কের উপর। কাজেই 'আভ্যন্তরীণ' ও 'বাহ্যিক' সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়, কারণ তারা আলাদা নয়। উভয়কেই উৎখাত করতে হবে একত্রে।

এসকল সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উপরিকাঠামো উভয়ের মধ্যে ব্যাপক বিস্তৃতভাবে সামন্তবাদের অস্তিত্ব রয়েছে। আসলে এ সমাজগুলোর সামন্ত থেকে বুর্জোয়া যুগে প্রবেশের দীর্ঘ, ধীর গতিসম্পন্ন ও কস্টকর কাল্পর্বের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করেছে। রাস্ট্র ও ধর্মের গাঁটছড়ার সম্পর্ক, সমাজে নারীদের স্থান, জোরালো পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক ও স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি হচ্ছে এই পরিস্থিতির বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এই সমাজগুলো সাম্রাজ্যবাদী করতলে অস্তিত্বশীল ছিল। এদেশগুলোতে যেটুকু আধুনিকায়নের অস্তিত্ব রয়েছে তার সর্বাগ্রগণ্য প্রতিভু হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীরা। একই সাথে এরাই এসব দেশের পশ্চাদপদ অর্থনীতিকে লেজুড় হিসেবে পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত জালে জড়িয়ে নিয়েছে। আধুনিক উৎপাদিকা শক্তির প্রচলন করার সময় তারা এক ধরনের অসম অর্থনৈতিক বিকাশকে চাপিয়ে চেয়, যেখানে অর্থনীতির অগ্রসর অংশ বিরাজ করে ব্যাপক বিশাল পশ্চাদপদ এলাকা দ্বারা বেষ্টিত ছোট বিছিন্ন দ্বীপের মতো। বিশ্বপূঁজিবাদী অর্থনীতির খোদ কার্যকারণই এসব দেশে স্থানীয় অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং বিশ্ববাজারের ভয়ংকর দোলাচল ও পরিবর্তনশীল পরিবেশগত পরিস্থিতির উপর

এদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। কখনও কখনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই সামন্তবাদী শক্তিকে জোরদার করার নীতি গ্রহণ করেছে। আফগানিস্তান হচ্ছে এর জ্বলন্ত উদাহরণ। এসকল দেশে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের আসল লক্ষ্য ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে মুনাফা, লোভ ও রাজনৈতিক আধিপত্য। কেবলমাত্র সামন্তবাদ বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রণনীতি ও কর্মসূচিই এসব সমাজের সামগ্রিক বিকাশের দ্বার খুলে দিতে পারে।

একমাত্র সমাধান নয়া-গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

রাজনৈতিক ইসলাম ব্যর্থ হয়েছে। যেখানে এটা ক্ষমতায় এসেছে সেখানেই তা জনসাধারণের জন্য নতুন কিছু করতে ব্যর্থ হয়েছে, পুরোনো নিপীড়িনমূলক সম্পর্কগুলোকে এটা অটুট রেখেছে। ধনীরা ধনী থেকেছে এবং গরীবরা থেকে গরীব। আর বরাবরের মতোই অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী থেকেছে। রাজনৈতিক ইসলাম নতুন শাসন ব্যবস্থাধীনে ঐতিহ্যগত নৈতিকতার মিলনের ও গোত্রগত ঐক্যের আচ্ছাদনকে প্রতিনিধিত্ব করে না। মুসলিম দেশগুলোতে তা মূলত ও মৌলিকভাবে সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই প্রতিনিধিত্ব করে। এটা শোষক শ্রেণীসমুহের একাংশের পতাকা, শাসন ক্ষমতার কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তি লাভে জন্য যা তারা উত্তোলন করেছে। জনসাধারণের জন্য এসব শ্রেণীশক্তির মাথাব্যথা ততক্ষণ তাদের স্থলবাহিনীর সৈন্যের জোগান দরকার। যেমনটা লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন, নিজেদের প্রকল্পগুলো চালাতে আজ প্রতিক্রিয়াশীলদেরও প্রয়োজন জনসাধারণকে। ইসলামি শক্তিগুলোর উত্থান মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলোর গভীর সংকটের ইঙ্গিতবহ। এই রোগকে সারানোর ক্ষমতা রাজনৈতিক ইসলামের চিহ্ন নেই, তা সারাতে পারবেও না। ইসলামি আবরণ থাক বা না থাক এই রাষ্ট্রগুলো ভেঙ্গে পড়ছে। এদের মুরব্বী মার্কিনিরা তাদের কেন তাদের সামরিক শক্তি মধ্যপ্রাচ্যে নামাতে বাধ্য হয়েছে তার মূল কারণ এটাই। এর দরকার হয়ে পড়েছে সশরীরে পরিস্থিতির মোকাবেলা করা। মার্কিনিরা তাদের বিমানশক্তি যতটা ইচ্ছা দেখাতে পারে। কিন্তু ক্রুদ্ধ জনসাধারণ ভূমিতে তাদের ধামাধরা নয়া-উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোকে ছেকে ধরেছে। যা তাদের নেই তা হলো শক্তিশালী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী পার্টিসমূহ, যারা জনসাধারণের একেবারে সামনের কাতারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম, সক্ষম মুক্তির জন্য তাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে ও তাদের অমিত শক্তিকে শক্তিশালী গণযুদ্ধে নিয়োজিত করতে এবং বিজয়ী নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করতে। এটাই হচ্ছে সামন্তবাদকে উৎখাত করা ও এসব দেশের হাজার বছরের সমস্যাজর্জর অবস্থা থেকে মুক্ত করার আর সাম্রাজ্যবাদী জোয়াল থেকে চিরদিনের জন্য মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়।

শেষ নোট

(১) **ইলিয়া পাওলোভিচ পেট্রোশেভস্কি, ইসলাম ইন ইরান**। ইসলামের ইতিহাসের ওপর লিখিত এই প্রামাণ্য মার্কসবাদী আকরগ্রন্থটিতে ইসলামের সামাজিক-রাজনৈতিক উৎস সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত মূল্যবান বিশ্লেষণ রয়েছে। পেট্রোশেভস্কির ভাষায়, খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতকের সূচনায় ইসলামের আবির্ভাব শ্রেণীবিভিক্ত সমাজের গতিপ্রকৃতির সাথে এবং উত্তর আরব্দের মধ্যকার জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। ইসলাম হয়ে দাঁড়ায় একটা মতাদর্শগত খোলস, যা একটা আরবীয় রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা করে এবং সারা আরবে এর সামরিক ও রাজনৈতিক সম্প্রসারণ ঘটায়।

মুহাম্মদ ছিলেন মক্কার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরিবার থেকে আসা একজন বুদ্ধিজীবী। তাঁর পরিবার (অবস্থাপন্ন কুরাইশ গোত্রের বনি হাসিম পরিবার) ছিলো এমন একগুচ্ছ দেবমূর্তির রক্ষক, বিভিন্ন গোত্র ও পরিবারগুলো যার পূজা করতো। মক্কার ভৌগলিক অবস্থান ছিল রণনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটা ছিল দাস ব্যবসাসহ গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক ব্যবসার কেন্দ্র। বাইজেন্টাইন (সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর) সাম্রাজ্যের সাথে ভারতের যোগসূত্র স্থাপনকারী বাণিজ্য পথ গেছে (দক্ষিণে) ইয়েমেন এবং তারপর (উত্তরে) মক্কা দিয়ে। ষষ্ঠ শতকে সাসানিডের অধীনস্থ ইরান ইয়েমেন দখল করে নিজের সুবিধা অনুযায়ী ট্রাঞ্জিট রুটকে বদলে দেয়। (ফলে) মক্কার বৈদেশিক বাণিজ্য অত্যন্ত কমে যায়। আরব বেদুইনদের আভ্যন্তরীণ পণ্য বিনিময়ের কেন্দ্র ছিল মক্কা ; এরা মক্কায় দুগ্ধজাত পণ্যের সাথে খেজুর, শস্য, হস্তশিল্প-সামগ্রী প্রভৃতি বিনিময় করট। কুরাইশ গোত্র মক্কায় বাস করতো। এর কিছু পরিবার ব্যবসায় ও সুদের কারবার থেকে অত্যন্ত ধনী হয়ে পড়ে, আর এর মাধ্যমে সর্বস্বান্ত করে অপেক্ষাকৃত ছোট পরিবার ও ব্যবসায়ীদেরকে (যেমন বনি উমাইয়াহ্ পরিবারকে, যারা শুরুতে ছিল মুহাম্মদের শত্রু, কিন্তু পরে তাঁর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং ইসলামি সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটায়)। অন্যেরা ছিল মাঝারি মানের ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী (যেমন মুহাম্মদের পরিবার, বনি হাসিম)। এরা সকলেই ইথিওপিয়া থেকে আনা নিষ্ঠুর দাস ব্যবসা করতো এবং দাসদেরকে কৃষিকাজে খাটানোর মাধ্যমেও শোষণ করতো। গোত্র সমাজের ভা-ন এবং জমিতে ব্যক্তি মালিকানার বিয়াকশ, আর এর ফলশ্রুতিতে প্রতিটা গোত্রের ধনী ও দরিদ্রের ভেতর পার্থক্য বেড়ে যাওয়াত আরবের উত্তরাঞ্চলের ভিত কেঁপে ওঠে। এক ভয়ংকর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট তাদেরকে নিমজ্জিত করে। এই সংকট মোকাবিলা করার জন্য মুহাম্মদ আরবীয় উপদ্বীপের যুদ্ধমান ও বিক্ষিপ্ত গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। এজন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় একটি নিখিল আরব ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র।

(২) ঊনবিংশ শতকে পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের কাছে পরাজয় বরণের ছাপ ইসলামি সাহিত্যে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৃটিশরা মধ্যপ্রাচ্যে তাদের আধিপত্য সংহত করে, আর একই কাল পর্বে তারা অটোমান সাম্রাজ্যকে ছিন্নবিছিন্ন করে। জারতন্ত্রী রাশিয়া ১৮৫৭ সালে ককেশাস ও মধ্য এশিয়ায় ঢুকে পড়ে। ঐ অর্ধশতক ছিলো ক্রান্তিকাল মুসলমান ও খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যের মধ্যকার বহু শতাব্দী পুরোনো ভারসাম্যের অবসান ঘটে। খ্রিষ্টান জাহান সামন্তবাদকে অতিক্রম করে এসেছিল। কিন্তু মুসলিম জাহান তখনো অতীতকে নিয়েই খাবি খাচ্ছিল।

যে সকল ইসলামি শক্তি অপেক্ষাকৃত কম মৌলবাদী এবং জাতীয়তাবাদের কাছাকাছি, তারা উপনিবেশ-পূর্ব অতীতের স্মৃতিকাতরতা-কে ব্যবহার করেছে ঐক্যবদ্ধ করার মতাদর্শগত ঝান্ডা হিসেবে : (ক্রুসেডের বিরুদ্ধে ইসলামি সাম্রাজ্যের বিজয়ী ও খ্যাতিমান যোদ্ধা) সালাউদ্দিন আইয়ুবীর প্রতিকৃতি নিয়ে রামাল্লাহর রাস্তা বরাবর মিছিল করেছে ; অটোমান সাম্রাজ্যের গুণকীর্তন করেছে, যদিও আরব সামন্ত ও বাদশাহ্গণ অম্লানবদনে বৃটিশদের সাহায্য করেছে একে উৎখাত করার কাজে ; আর বিরামহীনভাবে স্মৃতি তর্পন করে চলছে এই নিয়ে যে তখনো অন্ধকার যুগে পড়ে থাকা ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনায় ইসলামি সভ্যতা ছিল কত না অগ্রসর (যা আসলে সত্য, তবে আমাদের তাকাতে হবে ভবিষ্যতের দিকে!) এই ইতিহাস "ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীদের সাথে প্রতিযোগিতায় কেন বিশ্বের ইসলামি অংশ হেরে গেল" সে বিষয়ে অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এ বিষয়টা নিজেই মুসলিম দেশের বুদ্ধিজীবীদের মাঝে এক বিশাল ঐতিহাসিক গবেষণার ও বিশ্লেষনের বিষয়। কিন্তু তাদের এ বিতর্ক চলতি নিবন্ধের আওতার বাইরের ব্যাপার। (সে যাই হোক) মানব সমাজের বিকাশের এ ব্যাপারটাকে ব্যাপক ও গভীরভাবে জানা-বুঝা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও, সর্বহারা শ্রেণী আজকের নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যের (অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের) বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অতীত সাম্রাজ্যগুলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নয়। সর্বোপরি, তখন সর্বহারা শ্রেণীর

অস্তিত্ব ছিল না, কাজেই তাদের কোনো হারানো সাম্রাজ্যের জন্য দুঃখও নেই আর তা পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রাম করতে হবে না। দ্বিতীয়ত, প্রাচ্যে বা প্রতীচ্যের এই সব পুরোনো সাম্রাজ্য ছিল নিপীড়নমূলক,তা তার ধর্ম বা গোত্র যাই হোক না কেন, কাজেই এদের ব্যাপারে নস্টালজিয়ায় ভোগার কোনো কারণ নেই। সর্বহারা শ্রেণী খোলাখোলিভাবেই বলতে পারে, যেমনটি মার্কস বলেছেন : মৃতরাই মৃতদের গোর দিক (অন্য কথায়, বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণীগুলো কান্নাকাটি করুক তাদের অতীত নিয়ে)। লড়ার জন্য আমাদের রয়েছে ভবিষ্যত, সে এমন এক ভবিষ্যত যা অতীতের সকল শ্রেনীবিভক্ত সমাজ থেকে আলাদা।

(৩) চলামান ইসলামি আন্দোলনের মতাদর্শগত তাত্ত্বিকদের মধ্যে রয়েছেন : ইরানের খোমেনি, মোতাহারি ও তেল্লহানি, মিশরের সৈয়দ কুতুব, পাকিস্তানের মওদুদী এবং সুদানের আল্-তুরাবি।

(৪) ১৯৮০-র দশকে রেগান প্রশাসনের অধীনে সি আই এ নিকারাগুয়ায় নতুন সান্দানিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে গুপ্ততৎপরতা চালিয়েছে। সি আই এ -র অলিভার নর্থ কর্তৃক পরিচালিত সেই প্রতিক্রিয়াশীল নিকারাগোয়ান ও কিউবান ভাড়াটে বাহিনীর নাম হলো কন্ট্রা। এই অপারেশনের ব্যয়ভার বহন করা হতো কোকেন চোরাচালান ও ইসরাইলের মাধ্যমে ইরানে অস্ত্র বিক্রির টাকা দিয়ে। এই কেলেঙ্কারির নাম ইরান-কন্ট্রাগেট।

(৫) বিশেষত ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে, উদারপন্থী বুদ্ধিবৃত্তিক পত্রিকাসহ পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক মাত্রায় প্রচারণা চালানো হয়েছে যে ইসলাম অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদা, এটা অন্তর্গতভাবেই অন্যান্য প্রধান প্রধান ধর্মের তুলনায় বেশি অনড় ও অনুসন্ধানের প্রশ্নে কম মুক্ত, আর এটাই হলো কারণ যেজন্য আরব ও মুসলিম জাহান এত দরিদ্র এর নেতারা (সামন্ত শেখ বা অনুরূপ) এতটা পশ্চাদপদ। এটা এমনটা অর্থ করে যে পশ্চিমা জনগণ সে তুলনায় ভাগ্যবাণ কারণ তারা এমন শাসকগোষ্ঠীর অধীনে বাস করেছেন যাদের ভিত্তি হলো অপেক্ষাকৃত মুক্তমনা ইহুদি খ্রিষ্টীয় নৈতিকতা, আর একারনেই তারা ভোগ করে অধিকতর প্রাচুর্য ও স্বাধীনতা। এ হলো পশিমা জাত্যাভিমানী যুক্তি। ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন ও ঐতিহ্যের বিচারে এ বিষয়টা তুলে ধরা আবশ্যক যে বহু দিক থেকে কোরআন এবং ইসলামি ঐতিহ্য হলো ইহুদি-খ্রিষ্টীয় বাণী ও ঐতিহ্যের নব্যসংস্করণ এবং মূর্তবিকাশ- এমনকি সেই সাথে জরাথুস্টীয়বাদ, গ্রীক দর্শন প্রভৃতিরও। এসকল ধর্ম সমপরিমাণে নিপীড়িনমূল ও প্রতিক্রিয়াশীল।

ইসলাম কাঠামোগতভাবেই সংস্কারের অযোগ্য এমন বলাটা হচ্ছে অনৈতিহাসিক কথা। এর সমগ্র ইতিহাস জুড়েই দেখা গেছে, ইসলাম পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিস্থিতিতে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের নানা ধরন হলো গণবিদ্রোহ, জবরদখল, ক্ষমতার লড়াই, বিশাল বিতর্ক, ইসলামি দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে বিজ্ঞানের প্রসার, গ্রীক, মিশরীয় ও ব্যবিলনিয়দের থেকে শেখা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতিতে অগ্রগতি ইত্যাদির ফসল। একথাও সত্য যে মধ্যযুগের ইউরোপের তুলনায় ইসলামি দুনিয়া ছিল অনেক দিক থেকে বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগতভাবে অগ্রসর। সপ্তম শতকে যখন মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইউরোপ ছিল অন্ধকার যুগে নিমজ্জিত। এর পরের শতাব্দীগুলোকে খ্রিষ্টীয় মতধারা অতিক্রম করেছে ইনকুইজিশন, ভিন্নমতালম্বীদের খড়ের গাদায় পুড়িয়ে মারা প্রভৃতির ভেতর দিয়ে। যা হোক, ইউরোপের পুঁজিবাদী বিপ্লবগুলো ধর্মের ও সামন্তবাদের নিগড়কে উচ্ছেদ করে, অন্যদিকে ইসলামি দেশগুলো থেকে যায় সামন্তবাদী নিগড়ে আবদ্ধ। তবে পশ্চিমে পুঁজিবাদী বিকাশ খ্রিষ্টীয় আদেশে ঘটেনি। কেউ কেউ বলে থাকে, যদি প্রটেস্টানবাদ এবং ক্যালভিনবাদের উদ্ভব না হতো পশ্চিমে পুঁজিবাদেরও

বিকাশ ঘটতো না। কিন্তু ব্যাপার আসলে উল্টো। যখন পুঁজিবাদ বিকশিত হয়েছে (যা কিনা যেভাবে হয়েছে সেভাবে না হলেও পারতো, অর্থাৎ ইউরোপেই প্রথম উদ্ভুত হয়েছে) তখন তা এক সংহত বিশ্ব ইতিহাস গড়ে তুলে। আর এই প্রকৃয়ায় ইসলাম সেই সকল সমাজের উপরিকাঠামো হিসেবে বিরাজ করতে থাকে যেগুলো একই সাথে নিপীড়ক ও অধীন। যখন এ সকল দেশে ইউরোপীয় ও আমেরিকান উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে তখন তা আজ আমরা এমন দেখছি সেই রকম আধাসামন্ততান্ত্রিক আধাউপনিবেশিক অসম বিকশিত সমাজের উদ্ভব ঘটায়। এসকল সমাজের উপরিকাঠামোগুলোতে ইসলামের আধিপত্য দেখায় এখানে সামন্তবাদ এবং উপনিবেশবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বন্ধনের জোরালো উপস্থিতি রয়েছে। এভাবেই ইতিহাস বিকশিত হয়েছে, আর কোন ধর্ম অপেক্ষাকৃত ভালো সে বিতর্ক অনৈতিহাসিক।

আরেকটা অনৈতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হলো ইসলামকে "নাগাল ধরতে" হবে! এটা নাগাল ধরতে পারবে না, তার চেষ্টা করাও উচিত নয়। পুঁজিবাদী -সাম্রাজ্যবাদী দেশে বিশ্ব ইতিমধ্যেই কানায়-কানায় পরিপূর্ণ। ইসলামি দেশগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই তাদের ইসলামি লুথার বা কান্ট পয়দা করা। সে যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং তাকে পুনরুৎপাদন করার প্রচেষ্টা প্রতিক্রিয়াশীল হতে বাধ্য।

(৬) আলি শরিয়তি হলো ইরানের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ইসলামি চিন্তাবিদদের একজন। সে আধুনিক বিপ্লবী শিয়ামতবাদ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। সে শিয়াদের মাঝে নতুন ধারার জন্মদাতা প্রধানপুরুষ। আয়াতুল্লাহ খোমেনি তাকে একজন সমন্বয়বাদী হিসেবে বিবেচনা করে।

শরিয়তি শিয়াতন্ত্র উদ্ভবের একেবারে গোড়াতে যায় এবং দাবি করেছে যে এর অসীম বিপ্লবী সম্ভাবনা রয়েছে। সে মার্কসবাদের কিছুদিক সহ আধুনিক সমাজতত্ত্বে শিয়াতন্ত্রের নতুন পাঠ যুক্ত ক্রে যে দেশজ পরিচিতিসহ চিহ্নিত হয় উপনিবেশিকতা-বিরোধী হিসেবে, যা তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা রচনার শিরোনাম থেকে পরিচিত হয়ে ওঠে "নিজেতে ফিরে আসা হিসেবে"। সে পশ্চিমা শোষক ও শোষিতদেরকে একত্রে চিহ্নিত করে 'ওরা' হিসেবে আর নবী মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাকে চিত্রিত করে আধুনিক মুসলমান নারীদের অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে। তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল ইরানের বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে মার্কসবাদের বিকাশমান প্রভাবকে মোকাবিলা করা।

(৭) উনবিংশ শতকে শিয়াপন্থী পরম্পরাকে কাঠামোগত রূপদান করা হয় এভাবে : সবার ওপরে গ্র্যান্ড-আয়াতুল্লাহ, তারপর আয়াতুল্লাহ এবং তারপর হোজাত-উল ইসলাম। কেবলমাত্র গ্র্যান্ড-আয়াতুল্লাহরাই তাগলীদ চর্চা করতে পারে।

(৮) এখানে ইরানের গণমুজাহিদীন সংগঠন সম্পর্কে দুটি কথা বলা দরকার, কারণ কিছু ক্ষেত্রে অত্যন্ত মৌলবাদী ইসলামি আন্দোলন থেকে এটা আলাদা। এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬০-র দশকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গেরিলা সংগঠন হিসেবে এবং শাহ্‌ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এরা লড়াই করেছে। এর ছিল সুস্পষ্ট রাজনৈতিক রাজনৈতিক লক্ষ্য- শাহ্‌-এর উৎখাত এবং ইরান থেকে সাম্রাজ্যবাদের বিতাড়ন, আর এর ভবিষ্যত সমাজ সম্পর্কে অবস্থান হলো - "**শ্রেণীহীন এক তৌহিদী সমাজ**" প্রতিষ্ঠা, এমন এক শ্রেণীহীন সমাজ যেখানে সবকিছুর মালিক আল্লাহ্‌। জন্মলগ্নে এটা ছিল র‍্যাডিক্যাল ক্ষুদে-বুর্জোয়া সংগঠন, যা অনুভব করে যে মুসলমান জনগোষ্ঠীর মাঝে বৈধতা পাবার জন্য এর দরকার ইসলামের মাঝে আশ্রয় নেওয়া আর

যাতে মার্কসবাদী রাজনৈতিক সংগঠন থেকে নিজেকে পৃথক হিসেবে তুলে ধরা যায়। একই সাথে এরা অনুভব করে যে নিজেকে প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লাতন্ত্র ও ইসলামি মৌলবাদীদের থেকে আলাদা রাখার জন্য এদের দরকার মার্কসবাদী পরিভাষা যেমন শ্রেনী, শোষণ, সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদিকে এর তত্ত্বের অন্তর্গত বিষয়ে পরিণত করা।

সৌজন্য : এ ওয়ার্ল্ড টু উইন, ২০০২/২৮

::::::::::::::::::

অনুলিখন : অনন্ত

যোগাযোগ : ananta@inbox.com

উৎস : **যুদ্ধ ইসলাম প্রতিরোধ**; সম্পাদনা : চিররঞ্জন পাল এবং রাজেশ দত্ত; র‍্যাডিক্যাল প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০৯। পৃষ্ঠা : ১৪৮-১৭৪।